অরুণের ডাইরি

(১)

ফাল্গুন মাস। এ মধু-মাসে সব মধুর। চারিদিক সবুজ শ্যামল। যা কিছু পুরাতন হটিয়ে, নূতন আপনাকে বিলায়ে জগতের কাছে নাম কিনেছে। সমস্ত বন উপবন কুঞ্জ-কানন হাসছে আর ফুলকুমারী তাদের ওষ্ঠপুটে হাসির খোরাক্ জোগাচ্ছে। বেলার ফুলবাণ, চামেলির চকিত চাহনি, মতিয়ার মিঠে হাসি, পলাশের সরমে আরক্ত কপোল, উদিত-ভানুকে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছে * * * * সকলের মনে একটা শিহরণ লেগেছে। চারিদিকে নূতনত্বের সাড়া পড়েছে। প্রাণের মধ্যেও যেন একটা অভিনব রঙ্গ-মঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে—আর সেখানে ভবঘুরের বাঁধনহারা কল্পনা অবধি উঁকি মারছে, কখন বাস্তবে পরিণত হবে এই প্রতীক্ষায়। কি জানি কেমন করে আমাদের এই কল্পনার অবসান হ'ল, কিন্তু সত্য সত্যই দেখলাম যে আমরা তিনটি——বিজয়, আমি আর হরিপদ সেকেণ্ড-ক্লাস রিজার্ভ করে মধুপুর রওনা হয়েছি!

*

মধুপুর সহরটি বেশ। জলহাওয়ার জন্য একপ্রকার বিখ্যাত। ছোট ছোট ভিলা আঁকা ছবির মতন। এর পাশেই আমাদের বাসা। এ স্থানটি বড় পোয়েটিক্—তিনদিক বৃক্ষাবলীতে ছাওয়া, একদিকে ধূ ধূ প্রান্তর। বিটপীর মধ্যে শাল তমাল কেউ নয়। কেবল ফুলগাছের ঝাড়। গোলাপের গোলাপি প্রাণ, গোলাপি অধর, অজ্ঞাতসারে মন চুরি ক'রল। আর এক পাও নড়তে ইচ্ছা হ'ল না। তাদের রূপের ফাঁদে মসগুল হয়ে সেখানেই আবদ্ধ হলাম। জীবনে

এই প্রথমে ভালবাসতে শিখ্‌লাম। অন্তরের নিবিড় প্রদেশে নিবিড় করে ভালবাসলাম। *

সে দিন একটু বেলা থাকতেই ক্যামেরা-হাতে ভ্রমণে বাহির হলাম। আমাদের মধ্যে একজন কবি, তিনি নিলেন একটি পিক্‌লু. আর লেখার আয়োজন। যেন জগতের যত কিছু মনোহর সমস্তই নিখুত ভাবে এঁ কে নেবেন। তৃতীয়টি ভাবুক। ভাবে বিভোর—ভাবনাই তার জীবনের সাধনা..... ।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে এলাম বহুদূর। এখানে আমাদের গতি অবসান হল। সকলে ঝুপঝাপ বসে পড়লাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাশেই ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী নেচে নেচে চলেছে। কখনও কখনও মলয় পবন আবেগে নদীর জল চুমে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে জেগে উঠছে একটা শিহরণ। ক্রমে আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে গেল, জয় হল আঁধারের।

আজ তৃতীয়া। চাঁদ নিষ্প্রভ। গাছের কচি কচি পাতার উপর চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলে উঠল। বিজয় তখন বাঁশীতে এক-খানা গান ধ'রল।

"রক্ত বরণ অরুণ কিরণ
ডুবিছে সান্ধ্য গগন গায়,
আধার নামিয়া ধীরে ধীরে ধীরে
আলোক আঁধারে মিশিতে চায়"——

গানটি মধুর। সুরও মধুর। বংশীবাদক একজন পাক্কা ওস্তাদ। গানটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠল। মন গানে মাতোয়ারা। সহসা গান থেমে গেল। সুরের রেশ নাচতে নাচতে দূরে, অদূরে, অন্তরে, বাইরে, আমাদের বুকের মাঝে, ঐ নদীর পরপারে, বাজতে লাগ্‌ল। * *

আন্‌মনে কি ভাবতে ভাবতে চাইলাম কিছু দূরে, আর তৃতীয়ার ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে যতটুকু দেখা যায় তাতে প্রতীত হল যেন একটা পাগল ঝোপের পাশে বিড় বিড় করে কি বক্‌ছে। আমরা এসে দেখলাম, কেয়াঝোপে সেই লোকটি আঝোরে কাঁদছে, আর তার কোলে মাথা রেখে, একটি যুবতী নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাচ্ছে।

আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল। ডাকলাম ওহে.....।

সে তখন তার ভ্রমরকৃষ্ণ-ভ্রূ কুঞ্চিত করে বারেক আমার পানে তাকা'ল, তার পর, পাগলের মতন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় আমার মন গলে গেল। তার পাশে বসে পড়লাম—নির্ব্বাক্, নিশ্চল.....।

সে, তখন আমার হাতখানা তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে —দেখছ ভাই, স্রোত নেই, রক্ত সব হিম হয়ে গেছে, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা ঝাপসা ঝাপসা। অবিচার, অত্যাচার, অবজ্ঞা!

* * *

সে সজোরে আমার হাত ধরে বলে উঠল—ভাই শুন্‌বে, শুন্‌বে ঠিক?

একটু থেমে, নিশ্বাস নিয়ে, আবার বলতে লাগ্‌ল :—

সংসারের ঘাত প্রতিঘাত আমায় পাগল করেছে। আর এ আমার দিদি প্রতিমা।

প্রতিমা, ওঠ ভাই ওঠ।

প্রতিমা উঠিল না। দেখলাম এক অপূর্ব্ব সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা। কল্পনা রাজত্বে কতদিন ঘুরেছি, কিন্তু এমন একজনকেও দেখি নাই। আজ সে বৃন্তচ্যুত। সব পাপড়িগুলি এক এক করে ঝরে গেছে। বেদনায় আমার মন কানায় কানায় ভরে উঠল।

পাশেই পাহাড়ের বুক চিরে একটা ঝরণা নেমে গেছে। এর কুলু কুলু গান আকাশবাতাস মাতিয়ে ভেসে যাচ্ছে। স্থানটি মনোরম।

মাঝে মাঝে কেয়াফুলের খোস্‌বো দিল্‌খুস্‌ করে মনে মাদকতা আন্‌-ছিল। মনে কত কি আলু থালু ভাব উঁকি মারছিল, কিন্তু পরক্ষণেই এল কর্ত্তব্যের ডাক।

প্রতিমা সত্যই নিখুঁত প্রতিমা। পাপড়িগুলি ঝরে গেছে, কিন্তু তাদের রোসনাই চোখের সামনে ঝলমল করছিল। তখন কে যেন প্রাণের মাঝে, গোপন কোণে চুপে চুপে গেয়ে গেল :—

"কেন কারাগারে আছিস বন্ধ
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ"———

আমরা তখন এই ঝরাফুলের শিথিল পাপড়িগুলি চিতায় তুলে দিলাম!

* * * *

এখন সে আমাদের বাসায়। দিনকয়েকের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার বেশ একপ্রকার আলাপ জমে উঠল। সে আর কাঁদে না, কেবল ছোট খাট্ট দীর্ঘশ্বাস চেপে বার বার বলে—অবিচার, অত্যাচার, অবজ্ঞা!

এই উদাস যুবকটিকে আমার বেশ ভাল লাগত। আরও জানি না, কেন সেও আমায় দেখে বেশ খুসী হত। একদিন মিথ্যা আছিলায় বন্ধুদের সঙ্গে নিত্যকার সান্ধ্য ভ্রমণে অব্যাহতি পেলাম। তার পর, তার হাত ধরে, বাসার অদূরে একটি খোলা মাঠে গিয়ে বসলাম। নানান কথার পর গুছিয়ে তার জীবনের কথা পাড়লাম।

আমার কথায় সে বারেক হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসি ঠোঁটে মিলিয়ে গেল, যেন কোন অতীত ব্যথার স্মৃতি তার অন্তরের অন্তরে হুল ফুটিয়ে দিল। সে যাতনায় অধীর হয়ে একবার অনন্ত নীলিমার পানে চেয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত তারাগুলি গুণে নিল। পরে উদাস প্রাণে ব'ল্‌ল, —দেখ তারাগুলি কেমন জ্বলছে, ওদের জ্বলেই সুখ! আর আমি?

——আজীবন তিলে তিলে জ্বলেও শান্তি পাই না। জীবনটা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। তখন ভাই মনে হয় কি জান ?

——মনে হয় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চুরমার হয়ে যাক্, রেণু রেণু হোক্, কেবল আমি দীর্ণ প্রাণে অতীতের স্মৃতি বুকে করে উন্মাদ বেগে ছুটে যাই, অবাধ গতিতে। * * *

রাত অনেক হ'ল। আমরা ঘরে ফিরলাম। পরদিন, সে আমার কাছে অসঙ্কোচে সমস্ত বল্‌বে বলে নিষ্কৃতি পেল।

পরদিন প্রত্যূষে অশোক-শাখায় বুলবুলের গান হচ্ছে। রাত্রিতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটির সোদা সোদা গন্ধে আশ পাশ ভরপুর। হেনা সারারাত ধরে যে তার বুকের সৌরভ বিলিয়েছে, তার শেষ আবেশটুকু এলানো স্বপনের মতন ভোরের বাতাসের বুকে লীলায়িত হচ্ছে। * * *

তখন কাল মেঘের কোল ঘেসে গেয়ে গেল একটা দুষ্টু পাখী— 'বউ কথা কও, ; 'বউ কথা কও'

আমি এই নূতন সুহৃদ্‌টিকে ডাক দিলাম, কিন্তু কে শোনে ? উঠে দেখি তার শয্যা শূন্য, কেবল বিছানার উপর একটি ডাইরী। মনটা মুসড়ে গেল। তখন ডাইরীখানা তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করলাম ঃ—

(২)

"আমার নাম অরুণ। আমি বেদে ; পিতামাতার সম্বন্ধে জ্ঞান অল্প, তবে এই মাত্র জানি যে আমার পিতা কোন এক সাপকাটা রোগীকে বাঁচাতে এসে আমাকে ফেলে পলায়ন করেন। আমি তখন পাঁচ বছরের। যাদের বাড়ীতে পিতা আহূত হয়েছিলেন তারা নাকি কুলীন। গৃহস্বামী দয়া করে আমাকে গোয়াল ঘরে স্থান দেন। তাঁর দুটি

বিবাহ। দ্বিতীয় পক্ষেরটি বড় আদুরে। আমি একজনকে বড় মা অপরটিকে ছোট মা বলতাম। দুজনেই আমাকে ভালবাসতেন বড়মার, দয়ামায়ায় শরীর, অসুখ বিসুখ করলে তিনিই আমাকে দেখতেন। বড়মার মেয়ে প্রতিমা দাওয়ায় বসে খেলা করত আমারও খেলা করবার বড় লোভ হত, কিন্তু নিরুপায়। বড় মা সদা সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখতেন। তিনি জানতেন প্রতিমার সঙ্গে খেলতে যাওয়া আমার পক্ষে এবং তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

সেদিন পাশের বাড়ীতে ছোটমা আলতা পরছেন, আর বড়মা পুকুরে জল আনতে গেছেন এমন সময় আমি ছুটে এসে দাওয়ার পাশে দাঁড়ালুম। দিদি তখন তাঁর মোমের পুতুলটিকে ঘাঘরা করে কাপড় পরাচ্ছেন। আমি দাওয়ায় উঠলাম। দিদি আমার তাঁর খেলার সাথী করলেন। তখন হতে দিদির আর আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম প্রথম আমাদের মিলন বাধাহীন হতে পায় নাই। সে বাড়ীতে প্রতিমার খেলার সাথী আর কেউ ছিল না, কাজেই আমাকে তাহার সাথীরূপে পেতে বড়ই আগ্রহ। তার এই আগ্রহই ক্রমে ক্রমে আমাকে একটু একটু করে সাহসী করে তুলতে লাগ্‌ল। আমি তার কাছে যাই, ছোট ভাই বোনের মতন খেলা করি, কিন্তু ছোটমাকে দেখলেই সরে আসি। প্রতিমা কাঁদে। এই তার কান্নাই হল আমাদের পাবা মিলন-সূত্র। বলেছি ছোটমা আমাকেও ভালবাসতেন, ঠিক প্রতিমাকে যেমন বাসতেন তেমনি, আমারও তাই মনে হত। প্রতিমার কান্না, বড়মার স্নেহ, আমার সঙ্গে প্রতিমাকে খেলতে দেওয়ার সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা, এই গুলি মিলে আমাদের সম্পর্কটী খুবই ঘনিষ্ঠ করে তুলে ছিল। ছোটমা বড়মার অসাক্ষাতে, সম্ভবতঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে, 'পোড়াকপালে' বলে ডাকতেন। কিছুই বুঝতাম না। প্রায় আদর ভেবে তাঁর কোলে ঝাপিয়ে পড়তাম, কিন্তু